বিজয় দিবস ২০০৫,কিছু ভাবনা......

নন্দিনী হোসেন

বিচ্ছিন্ন কিছু স্মৃতিঃ- একাত্তর থেকে দুই হাজার পাঁচ। চৌত্রিশ বছর। হয়ত কালের বিচারে একটা জাতির জীবনে খুব দীর্ঘ সময় নয়। কিন্তু একজন মানুষের জীবনে চৌত্রিশ টা বছর মানে, তার জীবন থেকে সিংহ ভাগ সময় হারিয়ে যাওয়া। জীবনের গতিপথ নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়া। একাত্তরের অগ্নি গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া বাংলাদেশ দুই হাজার পাচেঁ এসে কোথায় দাঁড়িয়েছে,আমরা কম বেশী সবাই জানি। তার গতিপথ কোন দিকে মোড় নিয়েছে তাও বিস্মিত,বেদনার্ত হয়ে আমরা কেউ কেউ দর্শকের ভূমিকা নিয়ে দেখছি । আর কারো কারো উল্লাসের নৃত্য আজ আকাশ ছুঁয়েছে। এরা কারা,তাও আমরা জানি। যাই হোক ......।

একাত্তরের সেই দিন গুলোতে আমি ছিলাম চার পাচঁ বছরের শিশু। বিচ্ছিন্ন কিছু কিছু দৃশ্য এবং কিছু ভয়ের অনুভূতি ছাড়া সামগ্রিক ভাবে যুদ্ধের দিন গুলো নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে স্মৃতি কথা লেখার মত আমার ভাড়ারে তেমন কিছু নেই । তবে বিশেষ করে তখনকার যে অনুভূতি আমাকে বহুকাল তাড়া করেছে,তাহচ্ছে নিরাপত্তাহীনতা এবং আতংক । প্রতিদিন এক বুক ভয় নিয়ে ঘুমাতে যেতাম। শুনতাম পাকিস্থানী মিলিটারী নামক কি এক জন্তু যে কোন মুহুর্ত্যে এসে পড়বে ! আমাদের ছোট্ট দুই বোন কে নিয়ে আমার মায়ের অনেকটা অসহায় অবস্থা চলছিল তখন। বাবা লন্ডনে ছিলেন। যুদ্ধের পুরো নয় মাস আমরা বাবার কাছ থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিলাম। আমাদের দেখাশুনা করার মত বড় মুরব্বী শ্রেণীর কেউ ছিল না । আমরা তখন ছিলাম আমাদের আধা শহর আধা গ্রাম বাড়িতে। মার কাছে এই জায়গা টাই হয়ত নিরাপদ মনে হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন পরই বোঝা গেল এলাকাটা নিরাপদ তো নয়ই বরং বিপদের সম্ভাবনা এখানে আর ও বেশী। কারণ এই এলাকা হচ্ছে মূলত হিন্দুপ্রধান। ব্রিটিশ আমল থেকেই শিক্ষা দীক্ষায় ছিল উন্নত। এই এলাকায় আমাদের কার কোন বাড়ি তা দেখিয়ে দেবার মত লোকের কোন অভাব ছিল না চারিদিকে। আমাদের বাড়ি থেকে মাত্র তিন চার মাইল দূরে ছিল শান্তিকমিটির অফিস। সে জন্য সবাই ধরেই নিয়েছিল আমাদের এলাকায় পাকিস্থানীরা হানা দেবেই দেবে। কারণ হিন্দু দের নাকি রক্ষা নেই ! সেই প্রথম আমার হিন্দু শব্দ শেখা । যদি ও বিস্তারিত কিছু বোঝার উপায় ছিল না বয়সের কারণে। আমাদের দুই বোন কে নিয়ে মা প্রায় রোজই পাশের বাবলু দা দের বাড়িতে যান, অথবা বিকেলের দিকে কাকীরা আসেন। তাদের বাড়িতে স্কুল কলেজ পড়ুয়া বড় বড় সব ছেলে মেয়ে। সবার চোঁখে মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। প্রায় ই দু'একজন করে ছেলে হারিয়ে যায়। মায়েরা ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদেন। কিছু বুঝি না। বুঝার কথা নয়। শুধু এ টুকু মনে আছে ,শুনি তাদের ছেলেরা রাতের আধাঁরে নাকি কোথায় চলে গেছে। অথবা কাউকে রাজাকাররা ধরে নিয়ে গেছে। একদিন যুদ্ধরত আমার সম্পর্কে এক চাচা শুনলাম ধরা পড়েছেন পাকিস্থানী দের হাতে। তার মৃত্যুর খবর যখন পাওয়া যায় তখন তাঁর মায়ের বুক ফাটা কান্না আমি অনেক কাল ভূলি নি ।

আরেকটি স্মৃতি খুব উজ্জ্বল হয়ে আছে। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই,এক রাতে মামার কলেজের সহপাঠি বন্ধু ক্রিশ্চিয়ান একটা ছেলের পুরো আত্মীয় স্বজন সহ বারো চৌদ্দ জনের বিশাল একটা দলের আমাদের বাড়িতে আগমন। মামাই এনে তুলেছিলেন তাদের। তাদের যাওয়ার কোন জায়গা নেই। উচ্চ শিক্ষিত বিত্তশালী পরিবার। সে দলে বয়স্ক মানুষ থেকে ছিল তরুন তরুনী কিছু কলেজে ভার্সিটি পড়ূয়া ছেলে মেয়ে। দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত তারা ছিল আমাদের কাছে। ছেলেরা কেউ থাকত না । শুধু বৃদ্ধ দু'জন পুরুষ। বাকি সবাই নারী। আমার শুধু মনে আছে আমি মেয়েদের সাথে সারাক্ষন লেগে থাকতাম আটার মত। যুদ্ধের সময়কার কথা বলতে এই সবই টুকরো টুকরো ঘটনা আমার প্রত্যক্ষ স্মৃতি। বাকি সবই পড়ে শেখা,জানা ,বোঝা অথবা বোঝার চেষ্টা করা। আর যারা দেখেছেন যুদ্ধ ,যারা ছিলেন প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে জড়িত তাদের কাছ থেকে জানা। সব কিছু থেকে ছেঁকে তুলেছি সত্যি টুকু,মিথ্যা কে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি আস্তাখুঁড়ে......।

সম্প্রতি জাহিদ রাসেল আমাকে একটা চিঠি লিখেছেন,যা বিজয় দিবস সংখ্যা সাতরং এ প্রকাশিত হয়েছে। চিঠি টি ছিল ব্যক্তিগত,কিন্তু আমি তার অনুমতি নিয়ে এই চিঠি টি প্রকাশ করেছি। তার কারণ হচ্ছে এই চিঠির মধ্যে এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মনের যে অবস্থা প্রকাশিত হয়েছে,তা সবারই জানা উচিত এবং তা গভীর ভাবে ভাবা উচিত। আমি জাহিদের আগের প্রজন্মের মানুষ হলে ও,আমি ও বই পত্র পড়ে আর বড় দের কথা থেকেই মুক্তিযুদ্ধ কে উপলব্ধি করেছি। এই খানে জাহিদের অসহায়ত্বের সাথে আমার খুব একটা ফাঁরাক নেই।

জাহিদ ঠিকই বলেছেন বই পত্রে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দলীয় সংকীর্ণ দৃষ্টি ভঙ্গী তে সব কিছু উপস্থাপনা করা হয়। আর বড় দের কাছে শুনে শেখা ? সে তো একই পরিবারের কেউ মুজিব বন্দনা করেন তো আরেকজন জিয়া ছাড়া কিছু বূঝেন না। সব কিছুতেই জিয়া কে দেখেন। যেন মুজিব নামের কেউ কখন ও এ দেশে জন্মায় নি !আমি অত্যন্ত হতাশার সাথে আমাদের এই চরিত্র টা লক্ষ্য করে আসছি। ঘেন্না ধরে গেছে নষ্টদের নষ্টামী দেখে । সব কিছুরই একটা সীমা থাকা উচিৎ। কিন্তু এসবের আমাদের যেন কোথাও কোন সীমা পরিসীমা নেই। যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে তখন দেশটা মনে হয় সেই দলের জমিদারী। তখন এক পক্ষ বিড়াল রূপ ধারণ করে তো অন্য পক্ষ হয়ে যায় বাঘ। দেশের সাধারণ মানুষ ও এতেই যেন অভ্যস্থ হয়ে গেছে। কোথা ও কোন তাপ উত্তাপ নেই। স্বাধীনতা দিবস,বিজয় দিবস আসে ,চলে যায় । সবই আনুষ্ঠানিকতার ঘেরাটোপে আজ বন্দি।

একাত্তরের পরাজিত শক্তিঃ- যাদের সরাসরি সহযোগীতা এবং ইন্ধনে পাকিস্থানী হানাদারেরা সেদিন এই দেশের মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পরেছিল আজ তারাই ক্ষমতায় ! ক্ষমতা চিরস্থায়ী করতে এখন তারা মরিয়া। আমাদের জাতিগত চরিত্র আজ এত টাই পঁচে গেছে যে আমরা বিবেকের কাছে সৎ থাকতে পারছি না। মিথ্যা দিয়ে প্রাসাদ বানাতে চাই। জোড়াতালির তাসের ঘর যে আজ ভেঙ্গে পড়েছে তা কি রোধ করার সময় এখন ও আসে নি? যারা স্বদেশী ,স্বজাতি কে হত্যা করেছে,নারীর উপর চালিয়েছে পাশবিক নির্যাতন,দেশ কে মেধা শুন্য করার জন্য বুদ্ধিজীবি হত্যার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত-সর্বোপরি যারা এই দেশ টাকেই স্বীকার করে নি,তারা ক্ষমা পায় কি করে? বহু দলীয় গণতন্ত্রের নামে এই দেশে রাজনীতি করার সুযোগ পায় কি করে,অথবা কোন অধিকারে? আজ এরা বি এন পি র সাথে জোট বদ্ধ হয়ে ক্ষমতার পার্টনার,কাল কি পুরোটাই দখল করে নেবে ? আর কত নীচে নামব আমরা,এই দেশের মানুষেরা ?